দৈনিক সংবাদ

23

তারিখ ..6.. MAY 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম

পুনরুজ্জীবিত সিনেট ও অতঃপর

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

আমার এই কলাম লিখতে বসে যখন কাগজে–কলমে যোগাযোগ ঘটিয়েছি, তখন (২রা মে, ত্রিযামা যামিনীর প্রথম যাম) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যরা প্রস্তুত হচ্ছেন, আগামী দিনের অপরাহ্ন বেলায় তাদের উপর ন্যস্ত একটি গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য। ঐ লগ্নে সিনেট বসবে ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিনেট সদস্যগণ তিন সদস্যের একটি প্যানেল উপহার দেবেন। তারপর আশা করা যায়, অতিরিক্ত কালক্ষেপ না করে, চ্যান্সেলর মহোদয়, সেই প্যানেল থেকে একজনকে বেছে নেবেন উপাচার্য হিসেবে।

এই কলাম যেদিন ছাপার হরফে বের হবে, তার আগেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে নির্বাচনের ফলাফল; চ্যান্সেলরের চূড়ান্ত মনোনয়ন যদি ইতিমধ্যে নাও হয়।

যেহেতু দেশে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন নেই এবং গণতন্ত্র সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যুর দশায়, তাই একটু অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনগুলোকে। রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে, মানতেই হবে, উপাচার্য প্যানেলের নির্বাচন ছাত্র–সংসদ নির্বাচনের ধারেকাছে যায় না। তবু যে ইলেক্‌টোরাল কলেজ–কমবেশী একশ' সদস্যবিশিষ্ট সিনেট–উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য দায়ী, তার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। সিনেটের শিক্ষক সদস্যরা শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত। রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট সদস্যরাও নিবন্ধীকৃত স্নাতকদের ভোটে নির্বাচিত। ছাত্রসদস্যরা ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি। এছাড়াও আছেন পাঁচজন সদস্য, যাঁরা জাতীয় সংসদের সদস্য। মনোনয়নের পথে যে সদস্যরা এসেছেন, তারাও উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সিনেটের গঠনকে অবশ্যই ব্যাপকভিত্তিক বলা যায়। আরও ব্যাপকভিত্তিক হওয়ার সুযোগ ছিল। ব্যবসায় জগৎ, শিল্প জগৎ, সংস্কৃতি জগৎ ও অভিভাবকেরা তাদের প্রতিনিধি পেতে পারতেন সিনেটে।

তিন সদস্যের প্যানেল নির্বাচন হয় গণতান্ত্রিক উপায়ে, কিন্তু এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় গণতন্ত্রসম্মত পথে,–এতটা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ধারণা হিসেবে কিছুটা কেতাবী। একে অবাস্তব বলা হচ্ছে না, তবে এর বাস্তবতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত, অন্য সকল স্বায়ত্তশাসিত নামধারী সংস্থা ও কমিশনের তুলনায়। স্বায়ত্তশাসিত, এমনকি পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তুলনায়ও। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা। স্বায়ত্তশাসিত, কিন্তু বেসরকারী নয়, প্রাইভেট নয়,–যেহেতু প্রায় পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল। সরকারের উপর নির্ভরশীলতা স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী হওয়ার কথা নয়, তবে বাংলাদেশের বেলায় হয়েছে, কারণ সরকার জনমত নির্ভরশীল নয়। যেহেতু গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে, তাই প্রতিটি কুসুমেই কীট ঢুকে পড়েছে। কীট ঢুকেছে চতুর্থ রাষ্ট্রে, প্রেসে ; ঢুকেছে প্রশাসনে, ঢুকেছে বিচার ব্যবস্থায়; কীট ঢোকেনি এমন অক্ষত কুসুম কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি স্বায়ত্তশাসিত এবং সেই সঙ্গে বেসরকারী হতো, অর্থাৎ সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা না থাকতো, তাহলে এই কেতাবী স্বায়ত্তশাসন প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের রূপ নিত কিনা, এ প্রশ্ন করার সময় এসেছে।

সময় এসেছে, কারণ বাতাসে এখন বেসরকারী বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খবর আছে। আর বাতাসেই বা বলি কেন? সেদিন খবরে পড়েছি, সরকার মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ পেয়ে গেছেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যিনি বা যাঁরা গড়তে চান, কি শর্ত তাঁদের পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে কিছু কাজের কথা আছে, আর কিছু হাস্যকর কথাও আছে। হাস্যকর কথাটা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ব্যাংকে পাঁচ কোটি টাকার স্থায়ী জামানত দেখাতে হবে। এতে আমার মনে পড়ে গেল, বোর্ডে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল বা কলেজের অধিভুক্তির জন্য বিশ বা পঁচিশ হাজার টাকার স্থায়ী জামানত রাখার যে শর্ত আছে, সেই কথাটি। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, আমি যতোদূর জানি, ঐ জামানত থাকে পরিদর্শনের সময়ে। তারপর যেথাকার টাকা সেথায় চলে যায়। যাহোক, পাঁচ কোটি টাকার স্থায়ী জামানতের শর্ত পূরণ করে বিশ্বের নামীদামী কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ই জন্মদিনের আলো দেখতে পেত না; না প্যারিস, না অক্সফোর্ড, না কেমব্রিজ, না হার্ভার্ড। আমার ধারণা ছিল আমরা এতদিনে এই কেরানীসুলভ চিন্তা কাটিয়ে উঠেছি।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের শর্তাবলী দেখে মনে হতে পারে, খুব কড়াকড়ি করা হবে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। সময় যখন আসবে, তখন সবকিছুই অত্যন্ত মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে। সেটা জানেন বলেই সম্ভবতঃ একজন দৈনিক পত্রের সম্পাদকও কাতারে দাঁড়িয়ে গেছেন। তিনিও একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করতে চান। তবে তিনিই আসল ব্যক্তি, না তাঁর পিছনে আর কেউ আছেন, যিনি জনসমক্ষে পরিচয় দিতে কুন্ঠাবোধ করছেন, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।

সত্য ঘটনা যদি এই হয় যে, আমরা চাইছি–আমাদের কর্তাব্যক্তিরা চাইছেন–দেশে গোটাকয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হোক; তাহলে মঞ্জুরি কমিশনের শর্তাবলী ফাইলেই থাকবে, কোন শুভ প্রচেষ্টার বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আশা করি কমিশনও সেটা ভালোভাবেই জানেন। কমিশন অবশ্য এটুকু আত্মপ্রসাদ পেতে পারেন যে এই ব্যাপারে তার মতামত চাওয়া হয়েছিল। মতামত চাওয়ার ব্যাপারে ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয় বারবারই বিস্মৃতির শিকার হয়েছেন।

অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, বর্তমান সরকার আরও কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে অবশ্যই একটা নয়, গোটাকয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় জন্মগ্রহণ করবে। জমি উর্বর, শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। প্রস্তাবের পনের–ষোল বছর পরেও যে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় এখনও ফাইলে ফাইলেই ঘুরছে, এতে বিস্ময়ের কারণ কিছু নেই। জমি উর্বরা হলেও বীজ বপনের ঋতুআসেনি।

চুলোয় যাক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ফিরে আসা যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সিনেট অধিবেশনের কথায়। সিনেট পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এই সেদিন। বিগত আড়াই বছরকাল সিনেট ছিল জীবন্মৃত। কেননা আদালতের নিষেধাজ্ঞা ছিল। বিদায়ী উপাচার্যের কথায় মনে হত, এই পর্বতপ্রমাণ বাধা ঠেলে তিনি, তাঁর আন্তরিকতম ইচ্ছা সত্ত্বেও, সিনেট ডাকতে পারছেন না। ইতিমধ্যে নানা ঘটনা–দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। তার জায়গায় এলেন, চ্যান্সেলরের সরাসরি মনোনয়নে, অস্থায়ী উপাচার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহল শোরগোল তুললেন, এই মনোনয়নের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করলেন এবং আরও কিছু করলেন। কিন্তু অস্থায়ী উপাচার্য তার দু'টি সংকল্প ঘোষণা করে এই উদ্যত বিরোধিতার ধার ভোঁতা করে দিলেন। একঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবেন, ছাত্র–ছাত্রীদেরকে ফিরিয়ে আনবেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ও আবাসিক হলে। দুইঃতিনি অচল সিনেটকে সচল করবেন। দু'টি সংকল্পই কার্যকর

তারিখ ..6.. MAY 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম

হয়েছে। যে আইনগত বাধা পর্বতপ্রমাণ বলে ধারণা দেয়া হচ্ছিল, সেটি বালুস্তূপের মতো মিলিয়ে গেল। বাধাটা তাহলে একেবারেই কাল্পনিক ছিল; সন্দেহ করলে অন্যায় হবে কি?

সিনেটকে তাহলে এই দীর্ঘকাল অচল করে রাখা হয়েছিল কেন? সিনেট অধিবেশনে যোগদানেচ্ছু একজন সদস্যার বিরূপ আপ্যায়নের কারণে? না কি সিনেট রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন করতে যাচ্ছে, এই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য? মনে হয় প্রথমটি তাৎক্ষণিক কারণ হলেও আসল কারণ দ্বিতীয়টি।

পঁচিশজন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রবেশ করেছে গভীরভাবে এবং এটা এখন আর কোন গোপন কথা নয়। সরকার নিজেও এই দুর্নীতির উর্ধ্বে নয়, বললে একটু কমই বলা হয়। পোষ্টাল ব্যালটের জায়গায় প্রত্যক্ষ ভোটের দাবী উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় মহল থেকে, সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ষ্ট্যাট্যুটের পরিবর্তন যে মহল চান না, তারাই আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ও দরকারী নিষেধাজ্ঞাটি পেয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি মাননীয় আদালত যে যুক্তিতে ওই নিষেধাজ্ঞাটি অগ্রাহ্য করলেন, সেই যুক্তিটি তো বরাবরই কার্যকর ছিল। না কি ছিল না?

সে যাই হোক, সিনেট আবার সচল হয়েছে, আপাততঃ এটা একটা সংবাদ তো বটেই। সিনেটের বহু দায়িত্বের মধ্যে, উপাচার্য–প্যানেল তৈরী করা একটি। তবে সিনেটের নির্বাচন নিয়ে যতো দলাদলি, মারামারি, তা এই একটিমাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করেই। যেন সবকিছু নির্ভর করছে, কে উপাচার্য হচ্ছেন, তার উপর। সবাই ভাবতে চায় যে উপাচার্য তার পছন্দের লোক হবেন। উপাচার্যকে চ্যান্সেলরের পছন্দের লোকও হতে হবে, সেই জরুরী কথাটা চাপা পড়ে যায়। এবং এটা নিশ্চিত করার জন্য যেসব ব্যবস্থা রয়েছে, তারমধ্যে একটি হল পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পঁচিশজন সরকার–পছন্দ সদস্য যাতে অবশ্যই সিনেটে বসতে পারেন, সে পথ পরিষ্কার রাখা।

সরকার নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে উপাচার্য হিসেবে চাইবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেই সঙ্গে যদি মনোনীত ব্যক্তিটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় মহলে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এর একটিতেও যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে না। ছাত্র–শিক্ষক মহলে অগ্রহণযোগ্য হলে উপাচার্যকে পুলিশ প্রহরায় থাকতে হবে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলে সেই বন্দী উপাচার্যকে উদ্ধার করে আনতে হবে। আর সরকারের কাছে খুব বেশী অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলে কৃত্রিম সঙ্কটের সৃষ্টি হবে অদৃশ্য হাতের ইংগিতে এবং এমন সময় আসবে যখন উপাচার্যই অব্যাহতি চাইবেন এবং অব্যাহতি পেয়েও যাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করার কথা বলেন অনেকেই। সরকারও বলে থাকেন। কোন্ রাজনীতির কথা ভেবে একথা ওরা বলেন? উপাচার্য নির্বাচন ও প্যানেল থেকে মনোনয়নের মধ্যে যে গভীর রাজনীতি গোড়া থেকেই অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে, সে তুলনায় ছাত্র রাজনীতি তো ছার। ছাত্রদের কোন গভীর স্বার্থ নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে কে এলেন সে ব্যাপারে, অন্যদের আছে। শিক্ষকদের আছে এবং সরকারের আছে। তবে দু'টি স্বার্থের প্রকৃতি আলাদা।

আগামী প্যানেল কেমন হবে, তার রং কি সাদা না নীল; এ মুহূর্তে বলা যায় না। যিনিই আসুন এবং যে প্যানেল থেকেই আসুন, বিশ্ববিদ্যালয় মহল ও দেশের বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজ তাঁকে শুভেচ্ছাই জানাবে; কারণ সবাই চায়, বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পাক তার স্বাভাবিক চলার ছন্দ। অস্থায়ী উপাচার্য স্থায়ী হবেন কিনা, জানি না, না হলেও তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য এবং শুধু সিনেটকে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করার জন্য সকলের সাধুবাদ পেয়েছেন, এটা কম কথা নয়।